আল্লাহ্ মালেক !

শহীদ আহম্মদ খান (মন্টু)

সরকারী সফরে ১৯৬০ সালে করাচী থেকে লাহোর ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে হয়ে জহুরাবাদ গিয়েছিলাম। রেল লাইনগুলি ব্রড গেজ, বেশ চওড়া, করাচী ক্যান্ট হয়ে হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু প্রদেশ) পার হয়ে মুলতান গিয়ে পৌছলাম প্রায় ৪ ঘন্টায়। এর মধ্যে কাচেঁর জানালায় পুরু বালির আস্তর জমে আছে। তীব্র গতি, ঘন্টায় ৭০ কিলোমিটার ত হবেই বরং আরো একটু বেশী ও হতে পারে। সে দিন ছিল জুন মাসের সকাল বেলা প্রচন্ড গরম। বোধহয় জুনের শুরু, বারটা, মনে পড়ে বৃহস্পতিবার। স্পেশাল আর্মি কম্পার্টমেন্ট, আমাদের সৈনিকরা কেউ পাঞ্জাবী, কেউ বেলুচ আবার কেউ পেশোয়ারী, আমরা ৪ জন সুবেদার ওদের লিড্ করার জন্য যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে দুজন বরিশাল জেলার একজন পাঞ্জাবী আর আমি চট্টগ্রামের। সৈনিকদের নাম যথাক্রমে, ফজলদীন,সেকান্দর,আব্দুর রহমান, ওরা ৩জন আমরা ৪জন। মেজবাহ উদ্দীন, বরিশালের, সেলিম আসফাক (পাঞ্জাবী) আর আমি শাহেদ। সারা রাত ভ্রমন করার পর ধুলোয় বালিতে আচ্ছন্ন হয়ে পরদিন আমরা এসে পৌছলাম লাহোর ক্যান্টনমেন্টে, লাহোর ক্যান্টনমেন্ট বেশ সুন্দরভাবে নির্মিত ও সুরক্ষিত। এখানে নেমে ক্ষুধা পেয়েছিল কারণ রাস্তায় তেমন কিছু খাওয়া হয়নি কতকগুলো স্যান্ডউইচ, সিদ্ধ ডিম ও পরোটা খেয়ে আমরা যাত্রা করেছিলাম। যার যার ওয়াটার বোটলে যা পানীয় জল ছিল তাই পান করে কোনরকম তৃষ্ণা নিবারন করেছিলাম।

এখানে মুরগি মুসল্লম, বিরীয়ানী ভাজা বীফ খেয়ে ও গরম খাটি দুধ পান করে বেশ তৃপ্তি অনুভব করলাম। এরপর একজন গাটগোট্টা চেহারার মেজরের সাথে আমরা রওনা হলাম জহুরাবাদের মিলিটারী জীপে। এই মেজর যাকে সংক্ষেপে মেজর আইয়ুব বলা হয় তিনি ১১ পাঞ্জাব ইনফ্রেনটির দায়িত্ব প্রাপ্ত, লোকটা কিন্তু তেমন কর্তা ভাবাপন্ন নন যদিও তিনি আমাদের অনেক উপরের সোপানে। বিকেল ৪ টায় আমরা পৌছলাম জহুরাবাদ ক্যাম্পে। ওকানে আমাদের রসদ পত্র সব রেডি করার পর আমরা জহুরাবাদ ত্যাগ করলাম, জহুরাবাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য শ্যামল। বাংলার মত মাট ঘাট প্রান্তর নদ নদী সব আছে। পক্ষান্তরে বলতে হয় পশ্চিম পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী বিধৌত প্রান্তরগুলি জায়গায় জায়গায় রুক্ষ হলেও অধিকাংশ জায়গা বেশ শ্যামল। আমরা এখান থেকে প্রায় সন্ধ্যাবেলায় রওনা হলাম রাওয়ালপিন্ডি। কিছুক্ষনের মধ্যে এসে পৌছলাম এটক রেঞ্জে। এখানে একটি বালক হৃষ্টপুষ্ট সেন্ট্রি এগিয়ে এসে আমাদের আটকাল কিন্তু পাকিস্তানী বিশাল মেজরকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে গোড়ালীর বুটে ঘট করে আওয়াজ তুলে স্যলুট করল। সাধারন অনুসন্ধানের পর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল। এরা ও পাকিস্তান ইনফেনট্রির অন্তর্গত তবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের

হওয়ায় বেশ কড়া। আমরা যে এখানে কেন এসেছি আবার রাওয়ালপিন্ডিতে কেন আমরা যাচ্ছি তা জানতে চাওয়া সেনা আইনের খেলাপ বলে ধরে নেওয়া হয় তাই জানতে চাওয়ার চাইতে অগ্রসর হওয়াই উত্তম। এটক রেঞ্জ অতিক্রম করলাম বৃহৎ আয়তনের বাসে এতে

কমপক্ষে ২শ প্যসেঞ্জার এর সিট রয়েছে। তবে আমরা ছিলাম ১৫০ জন তার মধ্যে ৫০জন ছিল বেসামরিক ব্যক্তি। শুরু হল চকোয়াল পাহাড়ের শীর্ষ অতিক্রম অভিযান। বাস চলছে যেন একটি বিমান আকাশের গায়ে ভর দিয়ে উপরে উঠছে ত উঠছেই নীচের দিকে চাওয়া যায় না, নীচের প্রত্যেকটি বস্তু এমনকি মানুষকেও ছোট্ট লাটিমের মত দেখাচ্ছে আরও উপরে উঠলে নীচের যে কোন জিনিসকে বিন্দুর পরিমান মনে হবে। আমি ম্যপে দেখেছিলাম এর উচ্চতা ২৫০০০ ফুট। নীচে যে জিনিসটি অর্থাৎ ঐতিহাসিক নিদর্শন এ পাহাড় অতিক্রম করার পূর্ব মূহুর্তে, সে গুলো হল হিন্দুকুশ এর গুহা। সেখানে সে বহুবছর আগের প্রায় ২৫০ বৎসর ত হবেই সেই সময়ের পাথর ছোড়ার কামান। এগুলোর ভাস্কর্য্য শৈলী বড় নিপুন সম্ভবতঃ দ্বিগ্বী জয়ী আলেকজান্ডার এ পথে তার হিন্দুস্তান আক্রমন পরিচালনা করেন। হয়ত এখানেই মহাবীর পুরুর সাথে আলেকজান্ডার এর সম্মুখে সমর হয় অবশ্য এতে পুরু আলেকজান্ডারের বিশাল বাহিনীর কাছে পরাজিত হন্ কিন্তু তবুও আলেকজন্ডার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তার সঙ্গে আলেকজান্ডারের কি রকম ব্যবহার করবেন, উত্তরে পুরু বলেন 'রাজার সঙ্গে রাজার যে ব্যবহার সেই ব্যবহারই তিনি আশা করেন। তার এ নির্ভীক উত্তরে আলেকজান্ডার এর জেনারেলরা ক্ষুরধার খড়গ খাপমুক্ত করলেন যদি একটি সামান্য ইশারা করতেন তা হলে পুরুর বিরাট শীর ধুলায় লুণ্ঠিত হতো। এ ক্ষেত্রে আলেকজান্ডার এই বীর ক্লান্ত পরাজিত সৈনিককে অসম সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ তার রাজ্য ফেরৎ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না বরং তাকে বুকে চেপে ধরলেন। এ ছাড়াও বহু নীচে রয়েছে একটি সংকীর্ণ খালের মুখে সেকালের অনেকগুলো অনুপম শৈলী যা গ্রীক ভাস্কর্য্যের নৈপুন্যে সামৃদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে সেকালের যুদ্ধ রথ এক ঘোড়া চালিত গ্রীক মহাবীরদের যুদ্ধ, বিশেষ করে হেলেন অব্ট্রয়ের প্রেম অভিসার গ্রীক রাজপুত্র প্যরিসের সাথে, যার ফলে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, দ্রুত গতিতে এই যুদ্ধ রথ চালিয়ে প্রিয়তমা হেলেনকে নিয়ে গ্রীক রাজকুমারের পলায়ন। বলতে গেলে অনেক পুরানো ইতিহাস বৈচিত্র এই এটক রেঞ্জকে ঘিরে এখনও বর্তমান। যাই হোক আমরা চলতি চলছিই এ উচ্চশীর্ষ পার হলেই রাওয়ানপিন্ডির সীমা। চলা অবস্থায় অনেক প্যাসেঞ্জার বিশেষ করে বাঙ্গালীরা গুঞ্জন করে উঠে, যদি একবার ও একটু খানি টলে এই বিরাট বাস তখন নীচে বহুনীচে গহ্বরে পড়ে আমরা সবাই চুরমার হয়ে যাবো। সবাই চিৎকার করে উঠে 'আস্তে চালাও' কিন্তু ড্রাইভার গর্জে উঠে বুজদিল বারবার মরতে হে , বাহাদুর একই মর্তবা মরতেহে, চুপ যাও, আল্লাহ্ মালেক উহামে সামালেঙ্গে। রওনা হয়েছিলাম সকাল ৮ টায় , ঘামে সবাই ভিজে একশা তবু চলছি চলছিই, একবার মনে আসলো পাঠান এরা কি ভয়ডর কে কোনদিন পরোয়া করবে, যে স্পীডে এরা বাস চালায় পাহাড়ের সুউচ্চ চুড়ায়, মনে হয় এরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এ মরণ খেলায় ওরা হয়ত নির্ম্মম মৃত্যু বরণ করবে কিন্তু তখনও তারা এই নিরীহ অভিযাত্রীদের নির্ম্মম মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েনিজেরাও মরবে,চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে কিন্তু তখনও তাদের নির্ভীক ওষ্ঠে ভেসে উঠবে একটি বেপরোয়া হাসির ঝিলিক যাতে ওরা বুঝাতে চাইবে, আল্লাহ্ মালিক তিনি যা করেন তা মানতেই হবে, আর সাহসী একবারই মরে বহুবার নয়, আমরা আশা করবো আমাদের ভবিষ্যৎ বঙ্গসন্তানরা যাতে এমনি সাহসী হয়,পৃথিবী

সাহসীর জন্য, এ প্রবাদ চিরসত্য। বাংলার জীর্ণ অবস্থা উন্নয়নে প্রয়োজন হবে, দূর্জয় সাহস যা কঠোর সংগ্রামে অবশ্যই অপরিহার্য্য, লাঞ্চনাকারী, অত্যাচারী বলদৃপ্ত অবৈধ বিদেশী শাসকের ভুমিকায় যে শোষন, অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে মরণপণে, ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলেই তবেই আসবে সত্যকারের স্বাধীনতা ও সচ্চল জীবন যাত্রা, জয়তু বাংলা, এটা সাহসী দামাল ছেলের বাংলা, কাপুরুষের নয়।

শহীদ আহমদ খান (মন্টু), এডভাইজার, নজির আহমদ চৌধুরী রোড, আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম।